নাসীর আহমদ

তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান



অহিংসা * সত্য * অচৌর্য * অপরিগ্রহ * চতুর্যাম * কৈবল্য * ব্রহ্মচর্য

Tirthankar Mahabir Bardhaman by Nasir Ahmed

প্রকাশক

অনার্য কালচারাল সোসাইটির পক্ষে

বিশ্বনাথ মণ্ডল

সোনারপুর , দক্ষিণ ২৪ পরগণা ।

প্রকাশকাল

২৮শে মার্চ ২০১০ রবিবার

১১ই রবিয়াস শানি ১৪৩১ হিজরী

প্রচ্ছদ ভাবনা

আবু মাসুম

সাগর ক্লাব, ধূলাসিমলা, হাওড়া

মোবাইল ঃ ৯২৩৯৮১৯০৭৩

কম্পিউটার কম্পোজ

উলুবেড়িয়া প্রিন্ট হাউস

মোঃ ৯৮৩০১৭৪৬৫৬

মুদ্রণে

মুন্না অফসেট

শিয়ালদহ

দাম ঃ ৫-৫০ টাকা

প্রকাশকের কথা

লেখকের "গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত" পুস্তকখানি পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এ পুস্তকখানি আমাকে নতুন দৃষ্টিশক্তি ও দিশা দান করেছে। মহাবীরের জীবন ও কর্মের উপর আলোক সম্পাত লেখকের তেমনই এক মহৎ প্রয়াস। তাই আমি এই পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব সহস্তে গ্রহণ করেছি।

তীর্থঙ্কর মানে কি ? কেন তাঁকে মহাবীর বলা হয় লেখক তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। যারা নতুনের সন্ধানী তারা এটি পাঠ করে উপকৃত হবেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতি --

বিশ্বনাথ মণ্ডল

ভূমিকা

পতনমুখী পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচ্যের এখন পাশ্চাত্য থেকে শোষন, শাসন, জুলুম ছাড়া পাবার কিছু নেই। পাশ্চাত্য এখন অর্থনৈতিক দিকে থেকে পঙ্গু। তাদের সামরিক শক্তি জঙ্গী দমনে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বলতে কিছু নেই। তারা প্রার্চ্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে নষ্ট করেছে। তারা এখন বৈদিক যুগের অন্তপর্বে উপনীত হয়েছে। তারা পশু হয়ে পশুপীড়কে পরিণত হয়েছে। মহাবীর ও বুদ্ধ আসার পূর্বে ভারত এ দশায় উপনীত হয়েছিল। এখন এই মহাপুরুষদ্বয়ের শিক্ষা ভারতের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক জীবনের উন্নতির কারণ হয়েছিল। আজ আবার আড়াই হাজার বছর পরে সেই যুগ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের উপর '**গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত**' নাম দিয়ে আমার এক গবেষণা মূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এখন মহাবীর সম্পর্কে আমার ধ্যান ধারণা সুধী সমাজের সামনে পেশ করছি যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুপথ প্রাপ্ত হয়।

ধন্যবাদান্তে —

নাসীর আহমদ

মহাবীরের জীবন ও কর্মের পুনর্মুল্যায়ণ প্রয়োজন

ইসালমে পূন্যবানকে বীর বলা হয়। পৃথিবীতে যত নবী, পয়গমবর এসেছেন তারা সকলেই বীর ছিলেন। আবার এই বীরদের মধ্যে এমন কিছু বীরশ্রেষ্ঠ এসেছেন যাদের মহাবীর বলা হয়। মহাবীর বর্ধমান ছিলেন এমনই একজন মহাবীর। তিনি পয়গম্বর ছিলেন, না মুজাদ্দেদ ছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

২৪জন তীর্থঙ্করের কথা সবাই বলে গেছেন তবে তাদের মধ্যে ২২ জন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। মহাবীরের ২৫০ বৎসর পূর্বে প্রেরিত পার্শ্বনাথকে ২৩তম তীর্থঙ্কর বলা হয়। মহাবীরকে বলা হয় ২৪তম তীর্থঙ্কর। কিন্তু তার কার্যকলাপের মধ্যে এমন কিছু কার্যকলাপ রয়েছে যাতে তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নিতে দ্বিধা হয়। তিনি দীগম্বর বা উলঙ্গ থাকতে ভালোবাসতেন গোসল বা স্নান করতেন না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা পছন্দ করতেন না। এটা কোন নবী পয়গম্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। পরবর্তী কালে জৈনরাও তাঁর এই উলঙ্গপনাকে সমর্থ করেননি। তারা দীগম্বরের পরিবর্তে শেতাম্বর হওয়া পছন্দ করেন। অর্থাৎ উলঙ্গ না থেকে সাদা বস্ত্র পরিধান করে, ভদ্রবেশী হওয়া পছন্দ করতেন। এমন হতে পাবে যে বৈদিকদের প্রভাবে জৈন্যদের মধ্যে উলঙ্গ পনা বিস্তার লাভ করে। লোকেরা তাদের কুকর্মের সমর্থনে এটা মহাবীরের বিধান বলে প্রচার করে। হয়তো মহাবীরই অনাস্বড়র সাদা তহফন পরার বিধান দিয়ে থাকবেন। বৈদিকরা তাঁর ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করার জন্য তাঁকে দীগম্বর আখ্যা দিয়ে থাকবেন।

সব ধর্মের মূলই অহিংসা কিন্তু এই অহিংসা প্রেম কে ভারসাম্যহীন

করে মাছ মাংস খাওয়াতো দুরের কথা ডিম খাওয়াকেও হারাম মনে করা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয় । বৈদিক ধর্মের উপর জৈন ধর্মের এই প্রভাবের ফলে গান্ধীও নিরামিষভোজী ছিলেন কিন্তু শাকসবজীর ও যে প্রাণ আছে তা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস প্রমাণ করেগেছেন। সুতরাং শাকসবজি খাওয়াও অহিংসা নয়, হিংসারই নামান্তর । এই বিকৃত মানুসিকতার জন্য গান্ধী গোমাংস ভক্ষণ ও গোহত্যাকে পাপ বলে মনে করতেন এবং গোরক্ষা করাকে ধর্ম বলে মনে করতেন । অথচ বুদ্ধও সকলেই গোমাংস ভক্ষন করতেন । গোমাংস ভক্ষন যদি অধর্ম ও হিংসা হত তাহলে অহিংসার পূজারী গৌতম বুদ্ধ গৌমাংস খেতেন না । পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ এমনকি জৈনদের এই অহিংসার দর্শন গৌতম বুদ্ধ মেনে নেননি। তাই জৈনরা বুদ্ধের মাংস ভক্ষনকে অধর্ম বলে মনে করতেন । এই জীব বা পশুপ্রীতি মানুষকে পশুপূজাকে পরিণত করে ছিল । এই পশুপূজা বেদাতী বা বৈদিকদের নবীবিরোধী, মনু বিদ্বেষী করে তুলেছিল। একদিকে ছিল এই পশুপ্রেম আর অন্য দিকে ছিল জঘণ্য পশুবলীদান । ফলে বৈদিক ও জৈন এই উভয় ধর্ম তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছিল । নবী যুলকিকল বা গৌতম বুদ্ধের মধ্যমপন্থা জনচিত্ত আকৃষ্ট করেছিল ।এটাই ছিল ব্রাহ্মণ ধর্ম। এই ব্রাহ্ম ধর্ম বৈদিক ব্রাহ্মণরা হারিয়ে ফেলেছিল । জৈন ধর্ম এই বৈদিক ধর্মের সংস্কার করতে এসেছিল । পরে বৈদিক প্রভাবেও তারা প্রভাবিত হয় । মহাবীর জৈন ধর্মের সংস্কার সাধন করলেও বৈদিক ধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি ।

পৌরাণিক বৈদিক ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল মূর্তিপূজা, পুরোহিত তন্ত্র, জাতীভেদ, গোব্রাহ্মণ প্রতিপালন আর অন্য দিকে নাস্তিকতা । মূর্তি পূজা ও নাস্তিকতা পার্থিব পরতা বা দুনিয়া পরস্তীর বৈশিষ্ট্য । কোন তীর্থঙ্কর, নবীপয়গমবর, মূর্তিপূজা ও নাস্তিকতার শিক্ষা দিয়ে যাননি । তারা চিরদিন মূর্তিপূজা ও নাস্তিকতার বিরোধী একেশ্বরবাদী ছিলেন ।

তীর্থ মানে কেতাব । তীর্থঙ্কর মানে কেতাবধারী , কেতাবের উপর দন্ডায়মান, কেতাবের বাস্তবায়নকারী মানুষকে ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে মুক্ত করে

ইন্দ্রিয়জয়ী বা জৈন বানানোই ছিল জৈন ধর্মের উদ্দেশ্য । এই বন্ধন মুক্তি চরমপন্থায় পরিণত হয়ে বৈরগ্যবাদে রূপ নিয়ে গতি হারায় । তারা বন্ধনমুক্ত হতে গিয়ে পরণের বস্ত্রের বন্ধনও মুক্ত হয়ে নরপশুতে পরিণত হয় । নর ও পশুর মধ্যে পার্থক্য লুপ্ত হয় । পশুর যখন বস্ত্রের প্রয়োজন হয় না তখন মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন হবে কেন -- এই ছিল কুমন্ত্র ইবলিসের কু-মন্ত্রণা। কামনা বাসনায় প্ররোচিত হয়ে আদিপিতা ও মাতা বিবস্ত্র হয়ে ছিল । পরে তারা বস্ত্রাবৃত হয়েছিল। মানুষকে উলঙ্গ করা শয়তারে চিরন্তন কৌশল । এই বৈদিক বা বেদান্তিক আচারণ প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য । নবীর ধর্ম, ঐশী ধর্ম, কেতাবের ধর্ম এর বিপরীত । মহাবীর অতি সাধু হতে গিয়ে এই মধ্যমপন্থা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। জাঁকজমক প্রিয় কাপড়ে বাবু হওয়া যেমন নবীদের লক্ষ্য ছিল না তেমনি উলঙ্গতা নির্লজ্জতা নবীদের বৈশিষ্ট্য ছিল না । তারা বাসনা কামনায় আশনে বসনে সংযমী ছিলেন । সেলাই বিহীন বস্ত্র খণ্ড পরিধান করতেন, নোংরামী থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন । হজে সব হাজীই শ্বেতাম্বর জৈন হয়ে যায় । এহরাম বা শ্বেতাম্বর খুলে ফেলার ফলে জিতেন্দ্রিয়তার অবসান হয়। সত্যধর্মে লাগাতার জিতেন্দ্রিয়তা নেই, যেটা আছে সেটা তাকওয়া বা সংযম । বিলাসিতা ও উলঙ্গপনা উভয়ই বর্জনীয় কিন্তু চরম পন্থীদের প্রতি লোকের মোহ থাকে । চরমপন্থীদের কৃচ্ছসাধনায় মুগ্ধ হয়ে লোকে তাদের বীর, মহাবীর আখ্যা দিয়ে বসে । মহাবীর এ ধরণের চরমপন্থীও হতে পারেন কারণ মহাবীরের শিষ্যরা বুদ্ধের তপতেজ নেই এই অপপ্রচার চালাতেন । এমনও হতে পারে যে তিনি আওরঙ্গজেবের সমকালীন তথাকথিত ন্যাংটো সুফীসাধক নাস্তিক সারমাদের মতো ছিলেন । কামিনীকাঞ্চন মুক্ত যোগীদের তীর্থঙ্কর মেনে নেওয়া যেতে পারে । এমনও হতে পারে যে তিনি তীর্থঙ্কর ছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে বক্রমানসিকতার অধিকারীরা তাঁর চরিত্রহনন করেছেন ।

এতসব বিতর্কের মূল কারণ হল মহাবীরের জীবদ্দশায় তাঁর ধর্মমত ও বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়নি । মহাবীরের মৃত্যুর বহু বছর পরে তাঁর শিক্ষার সার

সংকলন করা হয় । এই সংকলনের নাম ছিল চর্তুদশ পূর্ব । এই চতুর্দশ পূর্ব গ্রন্থেরও অস্তিত্ব নেই । গুজরাটের জৈনরা মহাবীরের মৃত্যুর হাজার বছর পরে 'জৈন আগম' জৈন সিদ্ধান্ত নামে এক ফেকাগ্রন্থ রচনা করেন । শ্বেতাম্বর শাখার ন্যায় দিগম্বর শাখাও 'চতুবেদ' নামে আর আর এক সংকলন বার করেন । অন্যান্য ধর্মীয় সাহিত্য কাহিনী ও কিংবদন্তী মাত্র । মহাবীর সম্পর্কে যে দুটি কথা জানা গেছে তা হল তিনি দিব্যজ্ঞান বা অহিলাভ করেছিলেন এবং তিনি শেষতম তীর্থঙ্কর ছিলেন । তাঁর আগমন ছিল বণী ইসরাইলদের মধ্যে হযরত ঈশার (আঃ) আগমনের মতো । হযরত ঈশা (আঃ) বনী ইসরাইলদের শেষ বারের মতো সংশোধিত করতে এসেছিলেন কিন্তু তারা সংশোধিত হয়নি । মহাবীর জৈনদের শেষবারে মতো সংশোধিত করতে এসেছিলেন । অহিংসা ছিল জৈনধর্মের মুল কথা কেননা সমসাময়িক বৈদিক ধর্ম ছিল হিংসাশ্রয়ী । এই হিংসার প্রকাশ ঘটতো যাগযজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে আর পুরোহিতরা পুরোহিতের নামে পুরন্দর বা পুরধ্বংসকারী হয়ে গিয়েছিল । জনপদকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তীর্থঙ্করদের পুরোহিত প্রথা যাগযজ্ঞ ও বলীদানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল। দাঁড়াতে হয়েছিল ব্রাহ্মণের তলপিবাহক ক্ষত্রিয় রাজার বিরুদ্ধে । রাজা বিম্বিসার তাই জৈন ধর্মগ্রহণ করে ছিলেন । কিন্তু জৈনধর্ম গ্রহণ করলেও যাগযজ্ঞ ও ছাগ বলিদান প্রথা পরিত্যাগ করতে পারেন নি । বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তিনি এই বৈদিক প্রথা পরিত্যাগ করলে তার পুত্র অজাত শত্রু ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত জৈন ধর্মকে মেনে নিলেও বৈদিক ও জৈনধর্ম বিরোধী বিম্বিসারকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেননি । চাণক্যের তলপীবাহক শূদ্র-ক্ষত্রিয় চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবননে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । বিন্দুসারও সম্ভবত জৈন ছিলেন । অশোক পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে পুরোপুরি বৈদিক ব্রাহ্মন্যধর্ম বিরোধী হযে যান । তাই বৌদ্ধধর্মের পর রাজপৃষ্ঠপোষকতা অভাবে জৈন ধর্ম ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যায় । কারণ হিংসা বোধের ব্যাপারে এবং অসিংসার প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ ধর্ম ছিল সবলতর ।

হিংসাকে বাদ দিলে অহিংসা বা মানবপ্রেম স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠা হয় । হিংসা হল মিথ্যা ধর্ম । তাই অহিংসা হল সত্য ধর্ম । সত্যবাদিতা হল জৈনধর্মের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য । সত্য হলো হক বা আল্লাহ । আল্লাহ হলেন পরম সত্য । এই পরম সত্য বা পরমাত্মাকে পেতে হলে ত্যাগ প্রয়োজন কিন্তু চুরি করে ত্যাগকরলে কিছু হবে না । তাই চুরি ত্যাগ করে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে । ত্যাগ করতে হলে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি বর্জন করতে হবে । দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে । তবে মুক্তি লাভ বা নাজাত ঘটবে । সকল ঐশী ধর্মের মূল তত্ত্বই এই । তাই জৈন ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ত্ব নেই একথা ব্রাহ্মণদের অপপ্রচার মাত্র । জৈনরা যদি নাস্তিক হত তাহলে ত্যাগের পরিবর্তে ঋণ করে ঘি খেতে বলতো ।

সৃষ্টি কখনো অনাদি অনন্ত নয় । স্রষ্টাই শুধু অনাদি অনন্ত । বৈদিক ধর্ম এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় । তারা মানবসৃষ্ট ঈশ্বর বা দেবতায় বিশ্বাসী । তারা সৃষ্টি নশ্বর এ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয় । তারা সৃষ্টির বারবার রূপান্তরে বিশ্বাসী । নতুন রূপ ধারণ করে আত্মার নব জন্ম নিয়ে বার বার পৃথিবীতে আসবে । এ তত্ব জৈনধর্ম নয় । পরবর্তী কালে জৈনরা এ মিথ্যা তত্ত্ব গ্রহণ করে ছিল । অন্যথায় সত্যতত্বই ছিল জৈন ধর্মের মুল। সত্য ধর্ম, জৈন ধর্ম বিকৃত হলে বৌদ্ধ ধর্মের আর্বিভাব হয় ।

মহাবীর নিজে বিয়ে করেছিলেন কাজেই তিনি জৈন ধর্মে ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা বলে পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত চতুরর্যামের স্থলে নতুন বিষয় যোগ করেছেন এও সত্য নয়। হযরত ঈশাও (অঃ) বিয়ে করার সুযোগ পাননি । কিন্তু তা বলে তিনি সকলকে বিয়ে করতে নিষেধ করে গেছেন পাদ্রীদের একথা সত্য নয় । এ সব অতিভক্তির ফল ।

সংসার সত্য, সংসার জীবনও সত্য কিন্তু সংসার আসক্তি সত্য নয় । মুত্তাকী হিসাবে সাংসারিক জীবন, বৈষয়িক জীবন যাপন করা উচিত । মোক্ষলাভের জন্য ত্যাগও প্রয়োজন । দ্বীনের জন্য এই ত্যাগ বা কোরবানী না

করে বলিদান যেমন ছিল গোমরাহী মুসলমানদের বর্তমান গরু কোরবানীও তেমনি পার্থিবপরতার উৎসবে পরিণত হয়েছে। গোঘ্ন হওয়া এক জিনিস আর গরু কোরবানী করা অন্য জিনিস । বিচারশূন্য আচার শুস্ক ফেকার অনুসরণ । স্প্রিরিট বাদ চলে গেলে Spiritual এর থাকে কেবল রিচুয়াল (অনুষ্ঠান) । এই রিচুয়ালের অস্তিত্বও বৈদিক ভারত বরদাশত্ করতে রাজি নয় । আসলে ত্যাগ ও কোরবানী সমার্থক । আসলে ধর্ম হল সত্য , অহিংসা, সততা ও ত্যাগ বা কোরবানী হল সকল কালের সকল দেশের তীর্থঙ্কর ও নবী পয়গম্বরদের ধর্ম কিন্তু সত্য চর্চায় খামতি থাকার ফলে অহিংসা সীমা অতিক্রম করে গোমাংস ভক্ষনে বীতরাগ হয়ে মানুষ নবী বিরোধী ও আল্লাবিরোধী হয়ে নাস্তিক হয়ে যায় নাস্তিক হয়ে আবার গোপূজক ও নরপূজক হয়ে যায় । অক্ষত নবী চরিত্র না থাকার ফলে সব সত্যধর্মই এই বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে । জৈন ধর্ম তার ব্যতিক্রম নয় । কিন্তু জৈন ধর্ম যে তীর্থঙ্করদের যুগে সত্যধর্মই ছিলো তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প । ইহকালের ঘাট থেকে পরকালের ঘাটে পৌছাবার হাতিয়ার ছিল তীর্থ বা কেতাব । জৈনরা তা হারিয়েছে । তারা তাদের নবীদের তীর্থঙ্করদের সার্বিক ইতিহাসকেও ধরে রাখতে পারেনি । সৎ ব্রাহ্মণ অনুসারীরাও ব্রহ্মার কেতাব ও তার আসল পরিচয়কে ধরে রাখতে পারেননি । পারেনি ইহুদী ও নাসারা ও মুসলমানরা । কেতাব ও নবীকে কাগজে ধরে রাখলেও কর্মে ধরে রাখতে পারেননি । অন্যরা কাগজটাও হারিয়ে ফেলেছে । তাই কর্মও ভ্রান্ত হয়েছে কিন্তু সংশোধন করা যায়নি । এখন শেষ কেতাব ও নবীকে মেনে নিলে কাগজ ও কর্ম দুই সংশোধিত হয়ে যাবে । সেই একই বাণী ও কর্ম নিয়ে এসেছেন শেষ তীর্থঙ্কর ও শেষ কেতাব । এই সেই মূল শিক্ষা যা নিয়ে এসেছিলেন তীর্থঙ্কর আদম, নূহ, হুদ, ইব্রাহীম বা ব্রহ্মা কিংবা অন্যান্য তীর্থঙ্করগণ । মূল সত্য বিলুপ্ত হওয়ার কারণে জৈনরা, বৈদ্বিকরা , বৌদ্ধরা, ইহুদী, খ্রীষ্টানরা এবং প্রাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজা ধারীরা হারিয়ে ফেলেছে । যখন তাদের পূর্ববর্তী সত্য সাধকদের মৌল সত্যের নামে ফিরে আসার ডাক দেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় এতো

মৌলবাদী কথা। এখন ধর্মকে এই মৌলসত্য বাদ দিয়ে অসত্য, মিথ্যা, অভদ্র, অশ্লীলতা, চুরি, ছেনালী, বাটপাড়ির পথ ধরে চলতে হবে তবেই দ্রুত বৈষয়িক উন্নতি ও ভোগবিলাস লভ্য হবে। ত্যাগ করা যেতে পারে তবে তা ভোগের জন্য। সত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য দান ধ্যান, গৌরী দান, অর্থ পদ পজিশান প্রদান করে এমনকি জীবন দিয়ে হলেও সত্যপথের পথিককে খতম করা বিরাট বলিদান হিসাবে গহীত হতে পারে। এই পার্থিব লাভ যতই লাভই বয়ে আনুক তা লাভ নয়। অলাভ কেননা শেষ পরিণতি মহেঞ্জদড়ো অতপর পরকালে নাযাত বা মোক্ষ লাভ হবে না এবং জাহান্নামের জেল খানায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে কয়েদি জীবন যাপন করতে হবে।

এসব কথার জবাবে বলা হবে আত্মা-পরমাত্মা বলে কিছু নেই, চরম সত্য বলে কিছু নেই এসব অবাস্তব স্বপ্ন কাহিনী। সত্য বাণী হল খাও দাও মজা করো, মরে যাও। তাই ঋণ করে হলেও ঘি খাও, সুদে ঋণ লাও পরকাল বলে কিছু নেই, থাকলেও পবিত্র আত্মা, বোর্জগদের দোওয়ায় মুসকিল আসান হয়ে যাবে।

আমাদের মহাবীরদের স্মরণ করলে তারা আমাদের রক্ষা করবেন কিন্তু কোন মহাবীর কোন তীর্থঙ্কর একথা বলেন নি যে তারা অপরের আত্মার মুক্তির জিম্মেদারী নিতে এসেছেন। তারা বরং বলে গেছেনে আমরা কারোর দায়িত্ব নিতে আসেনি। তোমাদেরকে তোমাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি। নিজেদের মুক্তি করিয়ে দিতে এসেছি তাতে যদি পরনের বস্ত্র না জোটে দীগম্বর হয়েও পরমেশ্বরের স্মরণ করো, তার সন্তষ্টি লাভের জন্য দরকার হলে ব্রহ্ম চর্যা করা কেননা তোমার যখন পত্নি পালন করার সামর্থ নেই কিন্তু দোজখের আগুন থেকে মুক্তি লাভের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে কার্পণ্য করো না। ইন্দ্রিয়াসক্তিতে জড়িয়ে পড়লে ইন্দ্রিয়জয়ী হতে না পারলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশীভুত হলে কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাসচর্য তোমাকে গ্রাস করবে। তোমার দেহ তোমার আত্মার উপর জয়ী হয়ে যাবে। তুমি বেদাতী, বৈদিক হিংসুক গোধন

পূজারী হয়ে মুনষ্যবিদ্বেষী সার্থপর নরপশু হয়ে যাবে । তুমি মৎস্যবতার, বরাহবতার, কৃষ্ণ অবতার হয়ে মহাভারতকে শ্মশান মানবজাতির পাপ নিয়ে হাজির হবে । তোমার ঈশ্বরত্বের দাবী মিথ্যা হবে । সৃষ্টি স্রষ্ঠা হয়নি ও হবে না।

তীর্থঙ্করদের উপর এ মিথ্যারোপ করা হয় যে, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না । আসলে তাঁরা ব্রাহ্মনদের সৃষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না । তাঁরা অদৃশ্য স্রষ্ঠায় আস্থা রখতেন । দৃশ্য দেবদেবীকে পাত্তা দিতেন না বলে এ বিপত্তির উৎপত্তি হয়েছে । অন্যথায় পরমাত্মা যদি না থাকে তবে আত্মার মুক্তির কথা অর্থহীন হয়ে যায় । আত্মা কার কাছে বন্ধক আছে যে তা থেকে মুক্তির প্রয়োজন ? মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে এই জন্মান্তরবাদের কাহিনীতো বৈদিক উম্মী মুনীঋষিদের কল্পনা যাদের কাছে কোন ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়নি, যারা খোস খেয়াল বা ভিত্তিহীন আশা আকাঙ্খা পবিত্র কোরানের ভাষায় 'আমানি'-চামানির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন । তীর্থঙ্কররা আসলে ইহকালের পর পরকালের মুক্তির কথা বলে গেছেন ।ইহজীবনে নৈতিক বাঁধনের মাধ্যমে পার্থিব আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত মানুষের মতো ইহকালের ঘাট পার হতে পারলে পরকালের ঘাট পার হওয়া সম্ভব হবে । দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে ইহজীবন পরিচালনার জন্য ইন্দ্রিয়াসক্ত না হয়ে অতীন্দ্রিয়র সাথে যুক্ত হয়ে সৎ জীবন যাপনের কথা তারা বলে গেছেন । গৌতম বুদ্ধ তাই তার পূর্বে ২৪জন তীর্থঙ্করকে মার্গাধ্যয়ী বা পথ প্রদর্শক হিসাবে স্বীকার করে গেছেন । গৌতম বুদ্ধ নিজেও নাস্তিক ছিলেন না তা আমি আমার 'গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত' পুস্তকে সবিস্তারে আলোচনা করে দেখিয়েছি । সুরা তীন নামক পুস্তিকায় গৌতম বুদ্ধ যে নবী জুলফিকল ছিলেন তাও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছি । বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধ যখন তথাগত ছিলেন তীর্থঙ্কর গণও ছিলেন তথাগত প্রেরিত পুরুষ । নাস্তিকরা কখনো আত্মার মুক্তি নিয়ে ভাবেন নি । চর্বাক থেকে মার্কস পর্যন্ত কেউ আত্মার মুক্তির কথা বলেন নি । কোন নাস্তিক পণ্ডিতই নীতি নৈতিকতার কথা বলেননি। তারা বরং প্রতিষ্ঠিত নীতিনৈতিকতাকে কবর দিতে বলেছেন । গোসাল থেকে

রাসেল পর্যন্ত সকলেই আত্মা, পরমাত্মা ও নীতি নৈতিকতার চিতাশয্যা রচনার কথা বলেছেন । এরা পৃথিবীতে আত্ম সুখের জন্য হিংসা বিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ ও শ্রেণী বিদ্বেষেসের কথা বলেছেন। এরা মানুষকে সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবার তালিম দিয়ে গেছেন । এরা জেনা ব্যাভিচার , পরদারগমনের উপদেশ দিয়ে গেছেন । এরা মাতা কন্যা বধূর মধ্যে কোন ফারাক দেখতে পাননি এদের কাছে বিবাহিত জীবন legal prostilution বা বৈধ বেশ্যাগিরি ছাড়া কিছু নয়। তাই অনৈতিক অবৈধ বেশ্যাগিরি ও নৈতিক বিবাহিত জীবনের মধ্যে এরা কোন পার্থক্য খুঁজে পাননি । এদের নীতিবোধ যে দুর্বল তা নয় । এদের নীতিবোধ বলে কিচ্ছু নেই । তাই চুরি বিদ্যাকে এরা দোষনীয় বলে মনে করে না । চুরি করে শুধু ননী বা ঘি খাওয়া নয় চুরি করে পরের বউকেও এমনকি নিজের মামীকে নিয়ে বিবাহ-বহির্ভূত জীবন-যাবন করা আবার নিজের বৌকে মা বলে তাকে ফেলে দিয়ে পরের ঝিকে নিয়ে উলঙ্গ হয়ে রাত কাটাতে এদের দ্বিধা হয় না । এদের মুখেও আবার রাম নামও ধ্বনিত হয় । তবে পশ্চিমের নাংটাশ্বরেরা প্রাচ্যের নংটোশ্বরদের মতো এতো টা নিলর্জ্জ নয় । তারা মুখে কোন দিন ধর্ম ও নীতি নৈতিকতার কথা, অহিংসার কথা, সত্যা-সত্যের কথা বলেন না। তারা মিথ্যা, হিংসা, চুরি ছেনালী ও বাটপারীর কথা প্রকাশ্যে বলে । তীর্থঙ্করর‌া এসবের বিরোধিতা করে গেছেন । তাই তাদের নাস্তিক বলা যায় না । রুশো, মার্কস, রাসেল, গান্ধী, নেহেরু, কারোর নৈতিক জীবন বলে কিছু ছিল না । কিন্তু তীর্থঙ্কর, বুদ্ধ, জরাদশত, ঈশা, মুসা প্রমুখ নবী পয়গম্বরদের সম্পর্কে এসব কথা বলা যাবে না । তারা সত্য সুন্দরের উপাসক । মিথ্যা দেবদেবী, ব্যাভিচার, চুরি, হিংসা ও হানাহানির বিরোধিতা করে গেছেন এবং এসবের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ও সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছেন ।

মহাবীর তীর্থঙ্কর ছিলেন । তিনি দিব্যজ্ঞান বা পরম জ্ঞান অহি লাভ

করেছিলেন। এই অহিকে তদান্তন জনগনের ভাষায় 'কৈবল্য' বলা হতো। এখন 'কৈবল্য' শব্দের অর্থ বিকৃতি ঘটেছে। এখন কৈবল্য মানে বিকলতা প্রাপ্তি। যেমন কলা -কৈবল্য। যা ছিল মূল্যবান তা এখন মূল্যহীন। শব্দ ও অর্থের এই পরিবর্তন দেশ ও কালের পরিবর্তনের এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে যে, আজকের যুগে সেই প্রাচীন মনীষিদের যথার্থ স্বরুপ উপলব্ধি মুসকিল হয়ে গেছে।

এই মুসকিলের একটা বড় কারণ ধর্মশাস্ত্রের ভাষাগত পরিবর্তন। পৃথিবীর যে কোন মহাপুরুষ জনগণের ভাষায় কথা বলে গেছেন। মহাবীর প্রাকৃত বা জনগণের ভাষায কথা বলে গেছেন। কিন্তু সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে বৈদিক প্রভাবের ফলে জৈনরা সংস্কৃত ভাষায় তাদের দার্শনিক রচনা প্রকাশ করতে শুরু করে। ফলে বিপত্তি দেখা দেয়।

মহবীর ও বুদ্ধ উভয়ে ক্ষত্রিয় রাজকূলে জন্মগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রনীতির বিকৃতির সংশোধন করতেই নবীরা আসেন। এজন্য অধিকাংশ নবী রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ফলে রাজ্য ও রাজনীতিতে টানাপড়েন শুরু হয়। রাজা-মহারাজারা নবীর ধর্ম গ্রহণ করে রাজনীতিতে পরিবর্তন আনেন। সমকালীন ও পরবর্তীকালে অনেক রাজাই জৈন ধর্মী ছিলেন। এমনকি নন্দবংশও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জৈনধর্ম পরে বৈদিক সংস্কৃতির চক্রান্ত ও আক্রমণের শিকার হয়ে আপোষমুখী হয়ে বৈদিক ধর্মের শাখা উপশাখায় পরিণত হয়। বৈদিকধর্মের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালের জৈন ধর্ম বীরত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। তারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমুন্নতি এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম বাদ দিয়ে ধনপতি বৈশ্য হয়ে যায়। বৈশ্য বা বেণেরা কাজকারবারে নীতিহীন হয়। তাদের লক্ষ্য বৈষয়িকতা , আধ্যাতিকতা বা নৈতিকতা নয়। আজও গুজরাটী ও রা জপুতরা মাড়োয়ারীরা শাইলক ও ভুঁড়ুদত্তের মতো বেণে যাদের ধর্ম ছিল বৈষয়িক আসক্তি থেকে মুক্তি তারা বৈষয়িকতায় সবচেয়ে ধুরন্ধর অথচ মাছ মাংস না খেয়ে অহিংসার

পারাকাষ্ঠ দেখান । বড় বাজারের এই ব্যবসায়ীদের কারণেই পাঞ্চাশের মন্বান্তরে লাখ লাখ লোক মারা যায় । এদের কারণেই ১৯৪৬সালে কলকাতায় দাঙ্গা হয়। এদের কারণেই বাংলা ভাগ হয় । এরাই তথাকথিত অহিংস কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ।এরা মানুষের রক্ত শোষণ করে পিঁপড়েকে চিনি খাওয়ায় । বিশ্বনাথ সেবা সমিতি করে বিনামূল্যে জল বিতরণ করে ।এরা এতটা হীন হয়েছে বলেই এরা হীনতার পৃষ্ঠপোষক, গোরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক । এদের মধ্যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক বীরত্ব নেই, যা আছে তা তামসিকতা । এখন কোলকাতা তথা বাংলা এই ধনতন্ত্রীদের, বৈশ্যদের কবলে পড়ে হাভাতে , সর্বহারা। এরা সর্বভূক আর জনসাধারণ সর্বহারা । মহাবীরের ধর্ম আজ তাই কাপুরুষের ধর্মে পরিণত হয়েছে ।এ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বলা হয় পার্শ্বনাথের চার বিধানের সাথে মহাবীরের পঞ্চম বিধান দিয়ে গেছেনে ।এই পঞ্চম বিধানে নাম 'ব্রহ্মচর্য' ব্রহ্মচর্য মানে এখন চিরকুমার, আর তখন ব্রহ্মচর্য মানে ছিল শুচিতা বা পবিত্রতা। এই চার বিধান সততার সাথে পালন করা হত না, তার মধ্যে কপটতা ঢুকেছিল। মহাবীর এই কপটতা বাদ দিয়ে সততাসহকারে চার বিধান মানার কথা বলেছিলেন। সুতরাং এটা তাঁর কোন নবতর সংযোগ নয় ।

সুধি জনেরা এ সবের উপর আরও আলোকপাত করবেন এ আশা রেখে আমিও এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি । যদি ভুল ক্রটি হয় তাহলে সুধীজনের পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করনে সংশোধনের ইচ্ছা রইল ।কারণ আমার কথায় শেষ কথা নয় এমন আমি বলি না । প্রচলিত মতের বিরোধি হলেও কোন জিনিস অসত্য হয়ে যায় না । জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে সহনশীলতা আবশ্যক। আমি কারও মনে কোন আঘাত দিতে চাইনি তৎসত্ত্বেও কেউ যদি আহত হন তবে আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থী ।